করে হায়দরাবাদ নাকি বেঙ্গালুরু কোথায় দারুণ একটা জব পেয়েছিস।

–হুম ঠিকই শুনেছিলি। সে অনেক কথা। কী করবি ওসব জেনে?

–বাহ্ তোর কথা শুনব বলেই তো এলাম। বল না, চলে এলি কেন?

কফির কাপে আলতো চুমুক দিয়ে, জানালার বাইরে আকাশটার দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা শ্বাস নিল উজান। তারপর বলল, হায়দরাবাদে আমেরিকা বেসড্ একটা সংস্থা ছিল। প্রমিসিং কেরিয়ার অপোরচুনিটিস, গুড স্যালারি, ওয়েল অ্যাকোমেডেশন সব পেয়েছিলাম। আর সঙ্গে নেহাকেও।

–নেহা! সেটা কে?

–নীহারিকা গুপ্তা। কলকাতার মেয়ে। আমার সঙ্গেই চাকরি পেয়েছিল।

–খুব সুন্দর তো নামটা। তারপর?

–তার নামের মতোই সুন্দর ছিল নেহা। আমরা একে অপরকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। বাড়ি থেকে সবাই মেনেও নিয়েছিল আমাদের সম্পর্কটা। বিয়েটাও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই এল সেই অভিশপ্ত দিন। ৬ ডিসেম্বর।

–অভিশপ্ত! কিন্তু ওটা তো তোর জন্মদিন, তাই না?

–হ্যাঁ আমার জন্মদিন। সেদিন কথা ছিল বাইরে ডিনার সারার। ভেবেছিলাম কাছাকাছি কোনও রেস্তোরাঁতে যাব। কিন্তু নেহা হঠাৎ জেদ ধরে বসল, দক্ষিণী স্টাইলের রান্না তার আর ভালো লাগছে না। সে কোথায় শুনেছে হাইওয়ের ধারে নতুন একটা পাঞ্জাবি ধাবা খুলেছে। সেখানে দারুণ নর্থ ইন্ডিয়ান খাবার পাওয়া যায়, ওখানেই যাবে। আমি আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু ও শুনল না। অগত্যা রওনা হলাম বাইক নিয়ে। নেহা সঙ্গে একটা ছোট্ট কেক আর ক্যান্ডেল নিয়ে গিয়েছিল। কেক কাটা, ডিনার সব শেষ করে বেরোতে একটু দেরি হয়েছিল। হাইওয়ে ধরে কিছুটা আসার পর বাইকটা হঠাৎই বিগড়ে গেল। কিছুতেই স্টার্ট হয় না। অন্ধকার, নির্জন হাইওয়েতে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি আর নেহা। আর ঠিক তখনই আচমকা হাজির একটা হুড খোলা জিপ।

–কী হয়েছিল? অ্যাকসিডেন্ট?

–নাহ্। গাড়িটা সামনে এসে দাঁড়াতেই নেমে এসেছিল পাঁচজন যুবক। মদ খেয়ে চুর। তারা আমাদের তেলুগু ভাষায় কী সব বলেছিল। মাত্র বছর খানেক হল বেঙ্গালুরু যাওয়ার, দু'চারটে কমন টার্ম ছাড়া তেলুগুর কিছুই বুঝি না। আমরা ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে আমাদের অসহয়তার কথা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা কী বুঝল কে জানে। হঠাৎ দেখি তারা নেহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি বাধা দিতে গেলে দু'জন আমাকে জোর করে ধরে রাখল। চেষ্টা করেছিলাম খুব হাত ছাড়ানোর, কিন্তু পারলাম না রে।

–তারপর?

–তারপর একে একে নির্মম অত্যাচার চালাল নেহার উপর। তোরা যাকে বলিস গণধর্ষণ ... গ্যাং রেপ।

–কী বলছিস! তিতলির সারা শরীর কেঁপে উঠল।

আমার চোখের সামনে আমার ভালোবাসাকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল কতগুলো পশু। আর আমি অসহায় ভাবে শুধু দেখছিলাম। যাওয়ার সময় আমার মাথায় লাঠির মতো কিছু একটা দিয়ে আঘাত করেছিল। জ্ঞান হারিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। যখন জ্ঞান ফিরল নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাসপাতালের বিছানায়। বাবা–মা, সহকর্মীরা সবাই ছিল। শুধু ছিল না নেহা। শুনলাম আমরা নাকি অনেকক্ষণ হাইওয়ের ধারেই পড়েছিলাম। যখন উদ্ধার করা হয়েছে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অত্যধিক ব্লিডিং হওয়ায় সারভাইভ করতে পারেনি আমার নেহা। সব ছেড়ে চলে এলাম। জানিস তিন বছর হল এখনও ভালো করে ঘুমোতে পারি না। আয়নায় নিজের মুখ দেখলে ঘেন্না লাগে। সবসময় মনে হয় নেহার এই করুণ পরিণতির জন্যে আমিই দায়ী। নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না হয়তো।

হতভম্ব তিতলি যেন হারিয়ে ফেলেছিল তার মুখের ভাষা। আলতো করে চাপ দিল টেবিলের উপর রাখা উজানের হাতটাতে। নীরবে তাকিয়ে থাকল শুধু বন্ধুর অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে।

হঠাৎ উজানের একটা দরকারি ফোন আসায় তাকে উঠতে হল। আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

তিতলি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ভজনদার দোকান থেকে বেরিয়ে পিচ ঢালা কালো রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিতলির মনে হচ্ছিল, উজান নিজেকে অপরাধী ভাবছে। কিন্তু সে? সে–ও কি অপরাধী নয়? তিনবছর আগের এই হায়দরাবাদ ধর্ষণের ঘটনা বদলে দিয়েছিল তার জীবনকে। তাদের চ্যানেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্কসভা, সমাজতত্ত্ববিদ্ – মনোবিদের নিয়ে আলোচনা, নারী মুক্তি – নারী সুরক্ষা নিয়ে বড় বড় বিবৃতি এবং ধর্ষিতার প্রেমিকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চ্যানেলকর্তাদের কাছ থেকে বাহবা কুড়িয়েছিল তিতলি। চড়চড় করে বেড়েছিল চ্যানেলের টিআরপি। সঙ্গে তার কেরিয়ার গ্রাফও।

অন্যান্য ধর্ষণ কেসের মতো এ ক্ষেত্রেও ভিকটিম ও তার প্রেমিকের পরিচয় গোপন রেখেছিল পুলিশ। তাই তিতলি জানতেও পারেনি কলেজ জীবনের তার সব থেকে কাছের বন্ধু, হুল্লোড়ে, প্রাণোচ্ছল উজানের জীবনের ট্র্যাজেডিই হয়ে উঠেছে তার সাফল্যের সিঁড়ি। তার কাছে পুরো ঘটনাটাই ছিল কলকাতার তরুণীর হায়দরাবাদে ধর্ষিত হওয়ার কেস! নীহারিকা তো শারীরিকভাবে ধর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু উজান, সেও কি ধর্ষিত হয়নি? তাকেও তো সহ্য করতে হয়েছে ধর্ষণ – মানসিক ধর্ষণ। মৃত্যু মুক্তি দিয়ে গিয়েছে নীহারিকাকে কিন্তু উজানের মুক্তি হয়তো এ জন্মে আর হবে না। এই ক্ষত নিয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হবে আজীবন।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন সে শ্মশানের পাশে নদীর উপরের ব্রিজটাতে উঠে পড়েছে। পড়ন্ত বিকেলে শ্মশানের চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার দিকে তাকাতেই অলক্ষে পড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস। একটা কষ্ট যেন দলা পাকিয়ে উঠছিল তার গলার কাছটাতে। সত্যিই তো তারা কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা পেলেই তাকে লুফে নেয়। তৈরি করে ব্রেকিং নিউজ। দিনভর চলে আলোচনা, পর্যালোচনা। এভাবেই একটার পর একটা স্টোরি আসে। আবার চলেও যায়। সেইসব নিউজ আর স্টোরির নীচে চাপা পড়ে থাকে উজানের মতো মানুষরা জীবন্ত জীবাশ্ম হয়ে।

অঙ্কন ঃ অভি

সবসময় মনে হয় নেহার এই করুণ পরিণতির জন্যে আমিই দায়ী। নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না হয়তো। হতভম্ব তিতলি যেন হারিয়ে ফেলেছিল তার মুখের ভাষা। আলতো করে চাপ দিল টেবিলের উপর রাখা উজানের হাতটাতে। নীরবে তাকিয়ে থাকল শুধু বন্ধুর অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে। হঠাৎ উজানের একটা দরকারি ফোন আসায় তাকে উঠতে হল। আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে

অণুগল্প

মণিবাবুর বিশ্বদর্শন

দেবাশিস মহান্ত

প্রমিথিউস পাবলিশার্সের মালিক বাচ্চু বসুর সঙ্গে আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড করা ছিল। তাই মণিবাবু ঠিক সময়ে অফিসের সামনে হাজির।

মণিবাবু কবিতা লেখেন। বাচ্চু বসু আজ তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখতে চেয়েছেন। পাণ্ডুলিপি দেখে তারপর তিনি ডিসিশন নেবেন মণিবাবুর একখানা কবিতার বই বের করা যায় কিনা।

বেলা এগারোটায় বেশ রসিয়ে লাল–চা সহযোগে কিং–সাইজ গোল্ড ফ্লেক ফুঁকতে পছন্দ করেন বাচ্চু বসু। এমন সময় দরজা ঠেলে মণিবাবু ভিতরে ঢুকলেন। বাচ্চু সিগারেটের লম্বা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন – আসুন মণিবাবু। পাণ্ডুলিপি এনেছেন?

মণিবাবু পাণ্ডুলিপি এগিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, এনেছি, এই নিন।

বাচ্চুবাবু প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পাণ্ডুলিপিটা এদিক ওদিক চটকে বললেন, উঁহু, এ সব চলবে না মশাই, সত্তর দশক থেকে যে বেরোতেই পারলেন না! এটা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক বুঝলেন? সুড়সুড়ি চাই মশাই, কবিতায় সেক্স চাই। আপনার এ সব কবিতা ছেপে ব্যবসা লোপাট করার রিস্কে আমি নেই। আপনি আসুন।

রটন্তী ভালো কবিতা আবৃত্তি করে। আগামী মাসে তার আবৃত্তির দ্বিতীয় অ্যালবাম বেরোচ্ছে। রটন্তী মণিবাবুর দু'টি কবিতা পছন্দ হলে তার অ্যালবামে রাখবে বলেছিল।

মণিবাবু রটন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। কবিতা দেখালেন। রটন্তী রেগে টং হয়ে বলল, না মণিদা, এ সব চলবে না। স্মার্ট ঝকঝকে কথা চাই। ক্ষমা করবেন।

মণিবাবুর মনে পড়ল পাড়ার 'রক' ব্যান্ডের ছেলেরা তাঁর কবিতায় সুর দেবে বলেছিল। কিন্তু জীবনানন্দের একটি কবিতার কম্পোজিশন শুনে মণিবাবু আর সে পথ মাড়াননি।

যেখানে মন থাকে

তপতী ঘোষ

ছোট্ট মিষ্টুর হাত ধরে চলেছি, মা মরা একমাত্র মেয়েটাকে নিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছি কোথায় চলেছি কে জানে? হয়তো নিরুদ্দেশের পথে। চলতে চলতে ক্লান্ত মিষ্টু প্রশ্ন করে – 'বাবা রুনা, টুবাই, আয়েষা ওরাও সবাই কি দেশ খুঁজতে যাবে? দেশ মানে কি বাবা?'

চমকে উঠি। এক লহমায় অসংখ্য ঢেউ খেলে যায় মনের ভিতর। শিরায় শিরায় বেড়ে যায় রক্তের দ্রুততা। কী উত্তর দেব? চোখের সামনে ভেসে ওঠে সবুজে সবুজে ভরা ধানক্ষেত, শান্ত মায়াবি নদী। ছোট ছোট কুঁড়েঘর। কত স্নেহ, রাগ, অনুরাগ। বহু বাহুমেলা আলিঙ্গনের জন্য হঠাৎ মন কেমন করে। মনের মধ্যে বেজে ওঠে ঢাক, বাজে কাঁসর ঘণ্টা। সাঁঝের আকাশে আজান উলুধ্বনি একাকার। মনে পড়ে ফেলে আসা দিন, কাল, স্থান – যেটা ছিল আমার দেশ। নিজভূমে আজ আমি পরবাসী।

কেন?

আবার প্রশ্ন করে মিষ্টু – 'বলো না বাবা দেশ কাকে বলে?'

একদলা ক্লান্তি বুকে চেপে বলি, 'থাকার জায়গা মা, থাকার জায়গা। যেখানে মন থাকে, যেখানে মন থাকে।'

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক